শিক্ষার মিলন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২৮

মূল্য ।৵০ আনা।

শিক্ষার মিলন

একথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করচে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখচি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্চে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাক্‌লে ক্রোধের তাপ-ও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি যে-মানুষটা খাচ্চে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐই আমাদের পেয়ে বসেচে; সুযোগ এ পর্য্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোনো একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনি আমার বশে চল্‌বে একথা মনে করা ভুল। বস্তুত ড্রাইভারের মূর্ত্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্চে। অতএব শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চল্‌বে না বিদ্যাটা দখল করা চাই তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে কর, এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে? অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরো-পুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়খানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে ঊর্দ্ধস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার সখ দিনরাত এমনি তাকে পেয়ে বস্‌ল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁসই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার

গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে-রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলে দেখ্‌লে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্চে, তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং,—তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বল্‌লে, আমার আর কিছুতে দরকার নেই।

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে-মানুষ খাটো করেচে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্য্যাদা আছে সেই টুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সেদিকে তার বাঁধা নিয়মে একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি নিজেকেই ফাঁকি দিয়েচে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেচে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেচে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েচে। বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে। সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর পথ হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে, যে, তাদের ভাগে, হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে-বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেচে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কম্‌বে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু একথা যদি বল, শুধুত বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সয়তানীও আছে, তাহলে বলতে হবে ঐ সয়তানীর যোগেই ওদের মরণ। কেননা সয়তানী সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড় গৌরবের পদ দখল করে বসেচে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেচে বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্ত্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেচে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য কর্ত্তে পারে তাহলেই সে আর ঘটনার দলে থাক্‌বে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্ত্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল জগতে যা-কিছু ঘট্‌চে এসমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে; অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগে সে কর্ত্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা সুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্চে মান্‌ব না, মানাব। অতএব যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেচে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েচে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাক্‌তে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেচে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সঙ্কট তরে' যাচ্চে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেক্‌লে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাহিরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরচে, তারা আর কর্ত্তৃত্ব পেলনা।

পূর্ব্বদেশে আমরা যে-সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাক্‌চি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে

বসেচি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শুনেচি না কি, মন্ত্রগুণে পাল্‌কে-পাল্ ভেড়া মেরে ফেলা যায়; সে কি সত্য ?" ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।" য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ একথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্চে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এই জন্যে এই নিয়মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্ম-শক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেচি। বিশ্বব্যাপারে যে-মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মান্‌তে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না, তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না,—তখন সে বাইরের দিকে কর্ত্তাকে খুঁজে বেড়ায়, এই জন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠক্‌চে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালে-রিয়ার মশা পর্য্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্চে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিম দেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েচে কখন্ থেকে ? অর্থাৎ কখন্ থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেচে যে রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিষ নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে। যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেচে। যখন থেকে তারা জেনেচে সেই-নিয়মই সত্য যে-নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামী করে এসেচে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানকার অধিকাংশ প্রজাই সকল

বিষয়েই দৈবকেই মেনেচে নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনি আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্ত সমুদ্র সাঁৎরিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধ-মরা করে পৌছিয়ে দিলে। এর কারণ, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাহিরে নয়, যে-আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, "সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল একখানা চালাও বাঁচাতে পারলিনে কেন?" তারা বল্লে, "কপাল!" আমি বল্লেম, "কপাল নয়রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস্‌নে কেন?" তারা তখনি বল্লে "আজ্ঞে, কর্ত্তার ইচ্ছে হলেই হয়।" যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জলদান করবার ভার কোনো একটি কর্ত্তার। সুতরাং যে-করে হোক্‌ এরা একটা কর্ত্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর সকল অভাবই থাকে কিন্তু কোনোকালেই কর্ত্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েচেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেচেন, যাথাতথ্যতোঽর্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অর্থের বিধান তিনি যা করেচেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বতকালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্চে অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েচেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্ব্বল হয়ে থাক্‌তে হত; কেবলি এ-ভয়ে ও-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘুস জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু তাঁরি পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েচে যে-দলিল সে হচ্চে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল,—তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্চে যাথাতথ্যতোঽর্থান্‌

ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেচেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েচেন :—"বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চল্‌বে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম, একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম আরেক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম; এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও,—জয় হোক্ তোমার,—এরাজ্য তোমারই হোক্—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।" এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেচে, অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্ত্তাভজা, পলিটিকেল বিভাগেও কর্ত্তাভজা হওয়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্ত্তৃত্ব দাবী করেন না সেখানেও যারা কর্ত্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানী হবে, কেবল ছোট্ট ঐ "স্ব" টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েচে তার বাসাটা পূর্ব্বেই হোক্ আর পশ্চিমেই হোক্ তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলচি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্য্য নক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায় সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্য্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা, এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুল্‌লে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুস্কিলের কথা।

কেননা পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের, আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তাহলে সেকথা বোঝা যেত কেননা সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা; কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বল্‌লে তর্কের সীমানাগত জিনিষকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম ইস্কুলমাষ্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বল্‌বে "আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা।" কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে ত পবিত্রতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বল্‌বে, "আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয়।" এ জবাবটা একেবারেই ভাল নয়, কারণ যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয়, চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হয়, নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকে না সুতরাং কর্ত্তা না হলে তাদের চলেই না। আর একটি কথা, এই ভুল যখন সত্যের সহায়তা কর্ত্তে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। "মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে," না বলে' যেই বলা হয় "অপবিত্র করে" তখনই সত্য নির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা, কোনো জিনিষ অপরিষ্কার করে কি না করে সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। সেস্থলে হিন্দুর ঘড়া মুসলমানের ঘড়া, হিন্দুর কুয়োর জল, মুসমানের কুয়োর জল, হিন্দু পাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমান পাড়ার স্বাস্থ্য যথানিয়মে ও যথেষ্ট, পরিমাণে তুলনা করে' পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম, তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি, সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে' উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্যবস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বাইরে নির্ব্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ-সারার পক্ষেও ভাল রাস্তা? একদিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আরেক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি আর চালক যে তার দিকে অসত্য এই দুইয়ের

সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এই রকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্য্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারী বলে যদি থামকা বলে বসি ও ঘরটা অপবিত্র তাহলে যে-বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে-বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোট করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। একথা অনেকে বল্‌বেন, পশ্চিম দেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম্ম পরে মৃগয়া করত তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাইনি বস্ত্র জোগাইনি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এপারে ওপারে দস্যু-বৃত্তি করে বেড়াত আমরা কি তখন স্বরাজশাসনবিধি আবিষ্কার করিনি। নিশ্চয় করেচি কিন্তু কারণটা কি? আর ত কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলেম। পশুচর্ম্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুন্‌তে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্যচালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে চড়িয়ে দিয়েচে সে ত কোনো দৈব নয় সে ঐ বিদ্যা। অতএব আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কম্‌বে না,—ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সাম্‌লানো যাবে। একথার একমাত্র অর্থ আমাদের সর্ব্ব-প্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্চে।

এই পর্য্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সাম্‌নে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়; "সব মান্‌লেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েচ?" না, পাইনি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেচি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্য্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বল্‌চিনে—ইংরাজিতে বল্‌তে হলে হয়ত বল্‌তেম, titanic wealth। অর্থাৎ যে-ঐশ্বর্য্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ

ত্রিশ পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সাম্‌নে বসে থাক্‌তেম আর মনে মনে বল্‌তেম, লক্ষ্মী হলেন এক আর কুবের হল আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্চে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্চে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলি লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে, তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরীর মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড় পীড়া এইখানে তার একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজ্‌রার জানলায় বসে ছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরী মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারো হাতে ছিল মাদল, কারো হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে-কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দুন চৌদুন লয়ে চড়তে লাগ্‌ল। রাত এগারটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থাম্‌তেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সঙ্গত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকৃত তাহলে সমও থাকৃত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে, শান্তি নেই; উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই। সেই তাল-মাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল, ভরপুর মজা হচ্চে। আমি ছিলেম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝছিলেম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড় অসহ্য।

তেম্‌নি করেই আটলান্টিকের ওপারে ইঁট পাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেচে—"তালের খচমচর অন্ত নেই কিন্তু সুর কোথায়?" আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটী কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্যের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেচে, ততঃ কিম্‌!

এ কথা বারবার বলেচি আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে। আমি এই বলি,—অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর তাল রসের সংযম রক্ষা করে—বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যে-রূপ সেখানে দেখেচি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েচে। কেননা অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম্ম খেলা, তার বাসা আস্‌বাব, তার শিষ্টাচার ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই একেকে, সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেচে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিষটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয় বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেচি। সেখানে ভোজপুরী মাল্লার দল আড্ডা করেচে; তাদের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেচে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগ্‌ল।

পূর্ব্বে যা বলেছি তার থেকে একথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলিনে, রেলোয়ে টেলিগ্রাফ কল-কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ; এইখানে তার

প্রাচীর, তার পাহারা ; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায় পরকে তাড়ায় ; সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ, বস্তুকে নয়, আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে, সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না, সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যেদিকে চায় সেইদিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেচে, যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড় লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের পরে যে-নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তাহলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের ত পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্ব-নিয়মের দলে, সেই জন্যে সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু যদি এমন ধারণা হয় যে ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয় তাহলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে। কলকে ত আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারিনে ; তাহলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায় ? একরোখে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতে করতে পশ্চিম দেশে এই আত্মাকে কেবলি সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্ব্বলতায় কাৎ হয়ে পড়েচি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্চে ?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এম্নিতর চা-বাগানের ম্যানেজারীর সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েচে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেন না ভালোমানুষ লোকের নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস

করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে, তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক্, রক্ষামন্ত্রের তাবিজ হোক্, উকীলের দালাল হোক্, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক্! কিন্তু এই নেহাৎ ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার,—সেখানে দাঁড়িয়ে সে বল্‌তে পারে, "সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান আমার পরে এই দয়া করো।" অথচ এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজার-সম্প্রদায় নিখুঁৎ করে' উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বস্‌তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচি-ছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা, ডাক্তারখানা হাটবাজারের যে-ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্ম্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউনা মনে করেন আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলচি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড় করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেচে। কেননা স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুল্‌লে, অন্তরতম যে-আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃ-প্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে। এদিকে সমাজ ব্যাপারে, শিক্ষা বল, আরোগ্য বল, জীবিকার সুযোগ সাধন বল, নানা প্রকার হিতকর্ম্মেও মানুষের ষোলোআনা জিত হয়। কেন না পূর্ব্বেই বলেচি বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিষটা সত্য। সেই জন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় ফললাভের দিকে তাদের লোভের অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে, মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ ত একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্চে রিপু। রিপুর কর্ম্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে

তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধনলাভ করে, বললাভ করে, সুবিধা সুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্ব্বল করে।

একা মানুষ ভয়ঙ্কর নিরর্থক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে-এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোট বড় সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়র সাহেব নীলরঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্লান আঁকেন; তাকে ছবি বলিনে; কেননা সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির মহলের ব্যাবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্লান হল নির্ম্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যাবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, তবে মানব সমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠ্‌তে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক্, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই, কেননা, কুবেরের পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয় নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেচে একথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েচে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নিৰ্জ্জীব করেচে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েচে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেচে। কেননা আচারই হোক্ আর ব্যবহারই হোক্ তারাত তত্ত্ব নয় তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কা'কে বলে? যিশু বলেচেন, আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে-ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে-ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

পশ্চিম সভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেচে পূর্ব্বেই তার নিন্দা করেচি। কিন্তু নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েচে। ঋষি বলেচেন, মাগৃধঃ, লোভ কোরো না। "কেন করব না?" যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। "নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই।" ভোগ কোরোনা, একথা ত বলা হচ্চে না। "ভুঞ্জীথাঃ" ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। "তাহলে সত্যটা কি?" সত্য হচ্চে এই, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" সংসারে যা-কিছু চলচে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা কিছু চলচে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর কিছুই না থাকত, তাহলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড় সাধনা হত। তা'হলে লোভই মানুষকে সব চেয়ে বড় চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েচেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা, আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে লোভের দ্বারা নয়। সাতমাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্য্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্টোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্চে, আর "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" সেইটেই ডলারের ঘনধূলায় আচ্ছন্ন। এই জন্যেই সেখানে, ভুঞ্জীথাঃ, এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য, ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তাছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে। সেইজন্যে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে।

সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে হয়; "আরো" "আরো" হাঁকতে হাঁকতে হাঁপাতে হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার ঘোড় দৌড় করাতে করাতে ঘুর্ণি লাগে, ভুলেই যেতে হয় অন্য যা কিছু পাই আনন্দ পাচ্চিনে।

তাহলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েচেন। তাঁরা বলেন চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে, এক টা, দুটো, তিন্‌টে চার্‌টে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যা গণণার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় একথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কাদিয়ে বল্‌বে, "ততঃ কিম্!" তার দৌড়ও থাম্‌বে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিল্‌বে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল-পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুসি হয়ে বলে ওঠে, বাস্, হয়েচে।

এইত গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপ প্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেচেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্ব্বভূতকে আপনারই মত দেখেন এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত, আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর যে-বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মান্‌লে না, সে অকুণ্ঠিত চিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেচে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম্ গিলিয়েচে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েচে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েচে এরচেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠ্‌বেন—

"ঐ কথাটাইত আমরা বারবার্ বলে আস্‌চি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্ব-টাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেচে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই। একদিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেচেন,

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

"বিষয়ের সেবা ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়।" এর কারণ, বিষয়ের দায় আধি-ভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না, তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠ্‌তে হয়। তাই উপনিষৎ বলেচেন, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে,"—অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃতলাভ হবে। শুক্রাচার্য্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্য-পাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্চে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েচে। এইটে হচ্চে সাধনার সব নীচেকার ভিত,—কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামী করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এম্‌নি করে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েচে যে উপরপানে মাথা তোলবার ফুরসৎ তার নেই বল্লেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপরতলা যখন উঠ্‌বে তখনই, হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত, তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেচেন,

না জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্যবন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া,—এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করচে, সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে' সেইখানে লাগাচ্চে ঘা, এই হচ্চে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর পূর্ব্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেচে সেই হচ্চে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষদ দিয়ে গেছেন— বলেচেন,

বিদ্যাং চাবিদ্যাংচ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্য মিদংসর্ব্বং— এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেচেন তখন পূর্ব্ব পশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্ব্ব দেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জ্জীব; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্বসম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে-কথাটা একবার আভাসে বলেচি সেইটে আরেকবার স্পষ্ট বলা ভাল। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্ব্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়া-লিজ্‌ম্ হচ্চে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক-করা বলে প্রচার করে। পূর্ব্বে আমি বলেচি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তাহলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্বক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন

থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে; সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে, আর তাদের মনে রাখতে হবে এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয় নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মত জেনেচে, ন ততো বিজিগুপ্‌সতে, তারাই প্রকাশ পেয়েচে এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি মানুষের দল পর্ব্বতসমুদ্রের একএকটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েচে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তাহলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মত কেবলি হানাহানি করেচে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েচে তারা কোন্‌কালে লোপ পেয়েচে। আর যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েচে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেচে, এত রথ ছুটেচে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুট্‌ল, অম্‌নি মানুষের সত্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকশক্তি যাদের একত্র করেচে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল ত ভালই, নইলে সে দুর্য্যোগ। সেই মহা দুর্য্যোগ আজ ঘটেচে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগল, এক করবার আন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেচে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভারটা "আরে, আরে, হাঁ, হাঁ" করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েচে, কিছুতে নাগাল পাচ্চে না। অথচ একদল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বল্‌লে," সাবাস্, এ'কেইত বলে উন্নতি।" এদিকে, আমরা

পূর্ব্বদেশের ভালোমানুষ, যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি, ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সাম্‌লে উঠতে পারচিনে। কেননা যারা কাছেও আসে তফাতেও থাকে তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তাহলে পদে পদে ঠকাঠক্ ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয় অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক্, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয়, যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্চে অথচ মিলচে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডীর বাইরে তারা এক হতে শেখেনি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই, সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা ধরে, দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে, রাজাকে ভোলে দারোগাকে কিছুতে ভুল্‌তে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠ্‌ল সত্যের জোরে, কিন্তু ন্যাশনালিজ্‌ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডীদেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারিদিক থেকে নরবলির জোগান চল্‌তে লাগ্‌ল। যতদিন বিদেশী বলি জুট্‌ত ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগ্‌তে আরম্ভ হল,—"একেই কি বলে ইষ্টদেবতা? এযে ঘর পর কিছুই বিচার করে না।" এ যখন একদিন পূর্ব্বদেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল, এবং "ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি ধরি চিবায় সমস্ত"—তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবচে, এর পূজো আমাদের বংশে সইবে না। যুদ্ধ যখন পুরোদমে চল্‌ছিল তখন সকলেই ভাবছিল যুদ্ধ মিট্‌লেই অকল্যাণ মিট্‌বে। যখন মিট্‌ল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেচে সন্ধিপত্রের মুখস পরে। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড ল্যাজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁৎকে উঠেছিল আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই ল্যাজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো

চলেচে, বোঝা যাচ্চে ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারো ঘরের চাল আর বাকী থাক্‌বে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বল্‌চেন, যে, যে-দুর্ব্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনালিজ্‌ম্‌, দেশের সর্ব্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্য-তত্ত্বের উল্‌টোদিকে, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েচে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এতবড় সত্যের উপর যখন কোনো একটা মাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় এ'কে ধূলো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আন্‌লে শকুনির মত কপট দ্যূতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্ত্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারী তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চ্চা করাকে কর্ত্তব্য মনে করে। জর্ম্মণি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেচে। পশ্চিমের কোন্‌ বড় নেশন্‌ এ কাজ করেনি? আসল কথা, জর্ম্মণি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিকরীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেচে সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইন্‌কুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্য-দেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম্‌ অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কি? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে' প্রতিদিন অসত্য পীরের সিন্নি মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সর্ব্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে সকল রিপু, যে সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচার পদ্ধতি এর

প্রতিকূল তা' আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে' তুল্‌বে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে একথা না ভোলায় যে, একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্চে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রের ওপারে মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করচে, "আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্ম্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক ?" তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছক্, যে, "মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রের ওপারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বল্‌চে "শান্তি চাই।" এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেচেন, "শান্তং শিবমদ্বৈতং।" অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয়, যে, অতীত যুগের যে-আবর্জ্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্র দেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগ্‌তে সুরু করেচে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জ্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যূষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চ্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সর্ব্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই ? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না ?

এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুল্‌তে হবে এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের

বিরোধ মেটেনি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চল্‌বে না, তার অতিথিশালা চাই, যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে' সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্ত্তমানকালে শিক্ষার যতকিছু সরকারী ব্যবস্থা আছে তার পনেরো আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি, আতিথ্য করে না বলে' লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়, সেই জন্যেই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, আমি ভিখারী, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই। কে বলে নেই? আমিত শুনেচি পশ্চিমদেশ বারবার জিজ্ঞাসা করচে, "ভারতের বাণী কই?" তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে এত সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মত শোনাচ্চে। তাইত দেখি আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্সমূলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্য্য সভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের-বাদ্যের কড়ি মধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিমরাগেরই তার-সপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্বভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি কিন্তু তার সাধন সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে সে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, এ'কেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার

জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্ম্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব, নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জয়ামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই :—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

—o—

Printed by--Jagadananda Roy
at the "Santiniketan Press" Santiniketan, Birbhum.